মেঘ ছাপিয়ে বৃষ্টি
সাইদ হোসেন

মেঘ ছাপিয়ে বৃষ্টি

***

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেমবার, ২০০৮

Date of first edition publication: September 3, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at Website: www.sayedhossain.com
© Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-5-8
** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Megh Chapeeye Brishti, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

।। ১ ।।

অরণ্য জনপদে

ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হলো তপুর । ফজরের নামাজ পড়া হয়নি তার । তাড়াহুড়া করে চারটা খেয়ে নিলো সে । দুই স্লাইস ব্রেড, কাঁচা দুধ আর পাপড় ভাজা । ছেলেবেলা থেকে পাপড় ভাজা খেতে পছন্দ করে তপু । ঢাকায় ফিরলে তপুর মা রাহেলা বেগম নানা রকম পাপড় ভেজে দেয় । হরেক রকমের পাপড় দেখেছে তপু নিউ মার্কেটে । সুযোগ পেলে একগাদা নিয়ে আসে ।

হাসিব সাহেব, তপুর বাবা, বাসায় বসে নানা রকমের ছবি আঁকে আর রাতের স্কুলে মাষ্টারি করেন । বয়স গড়িয়ে গেলে হাসিব সাহেবের বিয়ে হয় তাই তপু ইউনিভার্সিটি ঢুকবার আগেই বুড়িয়ে যান । গত ডিসেম্বরে হাসিব সাহেব পয়ষট্টিতে পড়লেন ।

সরকারি চাকুরিতে হাসিব সাহেবের তিন যুগ গেছে । এখন রিটায়ার করে ঘরে থাকেন । বাসা-বাড়ির কাজের ছেলে-পুলেদের জন্য স্কুল খুলেছেন । রাহেলা বেগম মাঝে-সাঝে স্বামীকে সাহায্য করে সেই স্কুলে । সব মিলিয়ে দশ বারো জন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া গেছে । মাগরিব পড়ে স্কুল বসে, চলে দশটা পর্যন্ত । মাঝে-সাঝে খাবারের ব্যবস্থা করেন হাসিব সাহেব । খুব খুশি হয় তার ছাত্র-ছাত্রীরা ।

কৃষি অফিসার হিসেবে দেশের নানা প্রান্তে পোস্টিং হয়েছে হাসিব সাহেবের । কম করে হলেও পাঁচ জেলায় থাকা পড়েছে তপুদের । কত বার যে তপু স্কুল পাল্টিয়েছে, তার হিসেব নেই । রাহেলা বেগম বড় বড় পোটলা করে সংসারের জিনিষ-পত্র বেঁধে ফেলতেন তারপর সরকারি গাড়িতে চড়ে নূতন জায়গায় হাজির হতো । রাহেলা বেগমকে সাহায্য করতো তপু আর হাসিব সাহেব ।

তপুর সব চেয়ে ভাল লেগেছে যখন তার বাবা পার্বত্য-চট্রগ্রামে পোষ্টিং নিয়ে এলো । তপু তখন ক্লাস নাইনে পড়ে । ছুটির দিনগুলোতে পাহাড়ী ঝরনায় গোছল করা আর দিনের শেষে পাহাড়ী পথে হেঁটে যাওয়া । কি সুন্দর পাহাড়ী পথ একেবেকে উপড়ে উঠে গেছে । পথের দুধারে হাজারো সবুজের গাছ । সকালের রৌদ্রু এসে পড়ে সেই গাছে ।

সারাটা পার্বত্য-চট্রগ্রাম জুড়ে যখন সন্ধ্যে নামে, তখন ভয়াবহ নীরব হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ বনাচ্চল । খুব অচেনা মনে হয় বুনোভূমিকে । মনে হয় এখানে কখনো বুনোভূমি ছিল না, সন্ধ্যে নামতে এসে হাজির হয়েছে ।

সারা পার্বত্য-চট্রগ্রামে ছড়িয়ে আছে হাজারো পাহাড় আর টিলা ভূমি । পাহাড়ের খাঁজে গড়িয়ে চলেছে এক চিলতে নদী । সেই নদীর বুকে ছোট ছোট সাম্পান । সুযোগ পেলে তপু সাম্পানে চড়ে বসে, সাথে নেয় তার বাবাকে । আঁকাবাঁকা পথে গভীর থেকে গভীরতর গিড়ি পথে ঢুকে পড়ে ওরা তারপর গিড়িপথের নিভৃতে নিজেকে আবিস্কার করতে শেখে তপু । অনেক কিছু জানবার আছে গিড়ি গুহার কাছে । শুরু হয় তপুর ছবক নেয়া গিরি গুহার কাছে ।

তপু দেখলো, সু-উচ্চ পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে চিলতে নদীটা গড়িয়ে চলেছে । নদীর পানি খরস্রোতা বলে ময়লা জমবার সুযোগ নেই । পানির গভীরে, অনেক গভীরে থাকা লতা-গুল্ম আর মাছ চোখে পড়ে । মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে মাছ ধরে ফেলে তপু তারপর ওদের শ্বাস-কষ্ট শুরু হলে আবার ফিরিয়ে দেয় জলে । তপুকে ধন্যবাদ দিয়ে, এক বুক শ্বাস নিয়ে ওরা হারিয়ে যায় জলে ।

তপুর বাবা আগে হুইল বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন । বড় বড় বড়শি ফেলে বড় বড় মাছ ধরে আনতো । তপুর আপত্তির মুখে আর এগুতে পারেননি হাসিব সাহেব । তপুর পছন্দ না তার বাবা মাছের ফুসফুসে বড়শি ঢুকিয়ে খেলা করুক । খেলা যদি করতেই হয়, তার তো উপকরণের তো অভাব নেই ।

একবার হাসিব সাহেবের গলায় কাটা ফুটেছিল । টানা তিনদিন টানা হেচড়ার পর ডাক্তার সাহেব তুলে আনেন । কাটা ফুটবার কষ্ট হাসিব সাহেব বুঝলেন সে বারে । তারপর থেকে উনি আর বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরেন না । বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গেলেই তপুর মুখ ভার হয়ে আসে । এই বুঝি কোন মাছের ফুসফুসে বিধে গেল বঁড়শির ধাড়ালো পাতটা ।

তপুদের বাঙলোটা ছিল একেবারে পাহাড়ের খাঁজে । সেই বাঙলোর জানালা গলিয়ে বিস্তীর্ণ অরণ্য চোখে পড়তো । কি সুন্দর বড় বড় গাছ মাথা উঁচিয়ে আছে । সেই গাছের ফাঁকে হাজারো পাখির বাসা । লতা-পাতা দিয়ে টেকসই ভাবে বাসা বানিয়েছে ওরা । হাজারো বৃষ্টি আর উত্তাল হাওয়ায় ঠিক ঠিক ঝুলে থাকবে বাসাগুলো ।

একবার তপু পাহাড়ী পথে হাঁটছিলো । হঠাৎ দেখলো একটি পাখির বাসা পড়ে আছে রাস্তার পাশে । সেই বাসাকে ঘিরে উড়ে ফিরছে পাখি-ছানাদের মা । বাসার মুখ গলিয়ে উঁকি দিচ্ছে এক জোড়া খুদে পাখি । তপু আর দেরি করলো না । শক্ত করে বেঁধে দিলো বাসাটা যেনো হাজারো ঝড়ে পড়ে না যায় । মাকে পেয়ে পাখি ছানাদের কি হাসি । বার বার তপুকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো গলা ফাটিয়ে । তপু হাসলো তারপর ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলো অরণ্য পথে ।

।। ২ ।।

পদ্মার দেশে

মাস পাঁচেক হলো রাজশাহী এসেছে তপু প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি নিয়ে । ঢাকাতে কিছুদিন থাকবার পর তপুকে ওরা বদলি করে দেয় । এই প্রথম নর্থ বেঙ্গলের কোন শহরে এলো তপু ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ম্যানেজম্যান্টে মাস্টার্স করেছে তপু তারপর এই চাকরিটা পেয়ে যায় । ছিম-ছাম ব্যাংক অফিস । বাকি সাহেব এখানকার ম্যানেজার । দুই ছেলে আছে বাকি সাহেবের, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে । খালাতো বোনকে বিয়ে করেছেন বাকি সাহেব । সবাই মুনা ভাবি বলে ডাকে । কি হাসিখুশি না দেখায় বাকি সাহেবকে ।

ছোট খাটো এই রাজশাহী শহর । চার পাঁচ ঘন্টা ঘুরলেই শহর শেষ । শহরের এক প্রান্তে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি । দুই এক বার যাওয়া পড়েছে তপুর । বিড়াট এলাকা জুড়ে ইউনিভার্সিটি । ইউনিভার্সিটির পরেই শুরু হয়েছে ক্ষেত-খোলা । সারা বছর ধরে কৃষকেরা হরেক রকমের চাষ করে । সেই ফলনের গন্ধে ভরে যায় চারিপাশ । তারপর দিনের শেষে রাত নামে, রাতভর শিশির পরে ধানের শীষে । সকালের আলো এসে পরে শিশিরে । সেই আলোতে চিক চিক করতে থাকে শিশির দানা ।

যখন ধান পাকতে শুরু করে, তখন পাকা ধানের গন্ধে ভরে যায় ক্ষেতখোলা । কিষাণ-কিষাণীরা নাওয়া খাওয়া ভুলে সোনার ধান ঘরে তুলে আনে । বছরের শেষে শীতকাল শুরু হয় বাংলাদেশে । শীতের মৌসুমে কৃষকেরা শর্ষে চাষ করে । তখন ঘন হলুদে ছেয়ে যায় চারিপাশ । দূর থেকে মনে হয় পৃথীবি বুঝি তার রং পাল্টে ফেলেছ । হলুদে হলুদে ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ।

ঢাকার ছেলে তপু । বেশ কদিন লাগল নূতন পরিবেশে মানিয়ে নিতে । ছিম ছাম রাজশাহী শহর, সন্ধ্যে নামতেই লোক চলাচল কমে আসে । রাত দশটার পর ঘুমিয়ে যায় শহর । এখন রাজশাহীকে ভাল লাগে তপুর । ধীরে ধীরে মায়া জমছে শহরটার জন্য ।

আজ ব্যাংক থেকে বেরুতে অনেক দেরি হলো তপুর । কখন যে সন্ধ্যে নেমেছে, খেয়াল নেই ওর । রাস্তায় নামতে লাইট পোষ্টের আলো এসে পড়লো । তপু দেখলো, অনেক লাইট পোষ্টে বাতি আছে, আবার মাঝে মাঝে নেই । কতগুলো মিট মিট করে জ্বলছে ।

এদিকে শীত পড়তে শুরু করেছে সারা শহর জুড়ে । রাজশাহীর শীত অন্য ধাচে গড়া । শীত শুরু হলে আর স্বস্তি নেই । তপু দেখলো, কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছে লাইট পোষ্ট । কাছের মানুষ চেনা যায় না । মনে হয় কতগুলো ভূতুরে মানুষ ভারী চাদরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এতো শীত কখনো দেখেনি তপু । হাত-পা অবশ হয়ে এলো ওর ।

ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো তপু । রাস্তার চারিপাশে ছড়িয়ে আছে হাজারো কুয়াশার ফানুষ । ফানুষের মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো ওর । ছেলে বয়সের এক রিকশায়ালা এসে দাঁড়ালো । সারা শরীর কাল চাদরে ঢাকা, মাথায় গামছা পেচানো । অল্প আলোতে ওর মুখ দেখা গেল না । অন্য গ্রহের মানব বলে মনে হলো তপুর ।
তপু বলল, সাহেব বাজার যাবে ?
ছেলেটা মাথা নেড়ে সায় দিল ।

রিকশা ছাড়তেই শীতটা এসে জেঁকে ধরলো তপুকে । পকেট থেকে উলেন মোজা বের করে মুড়ে নিলো হাত । ঠান্ডা হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছে তপুর নাকে-মুখে । ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এলো মুখোবয়ব । মুখটা ঢেকে নিলো ভারী মাফলার দিয়ে । এক কাপ গরম কফি হলে ভাল হতো, মনে হলো তপুর ।

তপু দেখলো, রাস্তার দুপারে মানুষেরা আগুন জ্বেলে বসেছে আর কেউ কেউ চা-বিস্কুট খাচ্ছে । অনেকে আবার হারিপাতিল নিয়ে বসেছে । শীতের কারণে মানুষের আনাগোনা কম । সন্ধ্যে নামতে ঘরে ফিরেছে সবাই ।

রিক্সাটা যখন সাহেব বাজারে এলো তখন অনেক রাত । এই সাহেব বাজারে তপুর বাসা । সাহেব বাজারের শেষ মাথায় একটা তিনতলা বাড়ি আছে । এমন কোন রং নেই যা বাড়ির গায়ে লাগানো হয়নি । অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে বাড়ীটা । রং মহল বললে যে কেউ দেখিয়ে দেয় । রং মহলের ছাদে তপু ঘর নিয়েছে । অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘরটা । ঘর থেকে বেরুলে বাড়ির ছাদ । যেদিন পূর্ণিমা উঠে, আলোয় আলোয় ভরে উঠে ছাদটা । হালকা চাদরে তপু এসে দাঁড়ায় । অনেকক্ষণ ধরে জোছনা থাকে তারপর শেষ রাতে ডুবে যায় । আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে জোছনার আলো ।

হাত বাড়িয়ে সিকো ঘড়িটা মেলে ধরলো তপু । প্লাটিনামের কাটা রাত নটা ছুয়েছে । তপুর ঘরের পাশেই নিজাম সাহেব থাকেন । রাজশাহী ইউনিভার্সটিতে জিওগ্রাফি পড়ান । হালকা-পাতলা মানুষ, দাড়ি-গোফ আছে ভদ্রলোকের । সব সময় ইস্ত্রি করা প্যান্ট-সার্ট পড়েন । তপুর মতন খুব ভোরে উঠে, নামাজ পড়ে ব্রেকফাষ্ট সারে । নিজাম সাহেবের এক মেয়ে, নাম ছবি, স্কুলে পড়ে । বছর খানেক আগে স্ত্রী মারা যায় নিজাম সাহেবের ।

তপু দেখলো, শহরের বাড়িগুলো কেমন ঘেষে ঘেষে বানানো । প্রাইভেসী খুব একটা রক্ষা করা যায় না । তপুর জানালা দিয়ে নিজাম সাহেবের বাড়ির লোকদের চলাফেরা চোখে পড়ে ।

নিজাম সাহেবের মেয়ে ছবি বছর-খানেক হলো অজ্ঞাত অসুখে ভুগছে । বয়স কত হবে ? এই জানুয়ারিতে ছয়ে পড়লো । পেটের ব্যথায় প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায় ছবির, সেটা থাকে মধ্য বেলা পর্যন্ত । তারপর এক সময় ব্যথা কমে আসে । কত ডাক্তার দেখিয়েছে, বিদেশে নেয়া হয়েছে কয়েক দফা । কোন ফল পাননি নিজাম সাহেব । পেটের নাড়িতে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, সেটা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে । কোন ভাবেই ঠেকিয়ে দেয়া যাচ্ছে না তার গতি ।

প্রায় সকালে মেয়েটার ঘুম ভাঙে পেটের ব্যথায় তারপর বারান্দায় এসে বসে । সকালে উঠে তপু দেখে ছবি বসে আছে বারান্দায় । নিচু হয়ে আছে মাথাটা, ওর পাশে নিজাম সাহেব । ব্যথায় ব্যথায় কুকড়ে আছে ছবির মুখটা ।

তপু দেখলো, ছবি হাত বাড়িয়ে হাসু-দাসুদের খাবার দিচ্ছে । হাসু-দাসুরা ছবিকে ঘিরে কুটকুট করে চাল খাচ্ছে আর থেকে থেকে পাখা ঝাড়ছে । হাসু-দাসু ছবির দুই পোষা কবুতরের নাম, এক বছর হলো ছবির সাথে আছে । হাসু দেখতে সাদা, ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের মতন । দাসু কালো, গায়ে কালো কালো ফুটি আছে । হাসু মেয়ে আর দাসু ছেলে । রাজশাহীর গ্রাম থেকে ছবির বাবা এনেছিলেন, সেই থেকে ওরা ছবির সাথে আছে । প্রতিদিন সকালে চালের গুড়া ছিটিয়ে দেয় ছবি । হাসু-দাসু উড়ে এসে খেতে বসে । পাখা দুলিয়ে দুলিয়ে খায় ওরা ।

প্রায়ই ছবির পেটে ব্যথা হয় কিন্তু এত ব্যথার মধ্যেও হাসু-দাসুদের খাবার দিতে ভুলে না ছবি । চালের গুড়া, গম আর মুড়ি, হাসু-দাসুদের প্রিয় খাদ্য । খাবার খেয়ে ওরা উড়ে যাবে আবার ফিরে আসবে বিকেলের শেষে । বিকেল থেকে ছবি অপেক্ষা করে হাসু-দাসুর জন্য । ওরা এলে আবার খাবার বিছিয়ে দেবে । পাখা নাড়তে নাড়তে খেতে শুরু করে ওরা । খাবারের পর ঘরে ঢুকে ওরা । বাড়ির দুয়ারে উঁচু করে ঘর বানানো হয়েছে যেন বেজি বা বিড়াল না উঠতে পারে । মাঝে মাঝে ঘরগুলো পরিস্কার করে ছবি ।

গোছল করে নামাজ পড়ে নিলো তপু তারপর সোফায় এলিয়ে বসলো । পেপার দিয়ে গেছে হকার । পেপার পড়তে শুরু করলো ও । দেশী-বিদেশী খবরে ঠাসা পত্রিকার পাতা । উপকূল অন্চলে গাছ কাটা নিয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছি । খুব মনযোগ দিয়ে পড়লো খবরটা । এদিকে অফিসের সময় পার হয়ে যাচ্ছে । তপু আর দেরি করলো না, ঝটাপট কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লো । বেরুবার মুখে দেখলো ছবি বসে আছে, মাথাটা নিচু হয়ে আছে মেয়েটার ।

তপুরা যখন পার্বত্য চট্রগ্রাম ছিলো, তখন তপুদের একটা বোন হয়েছিল । তপু তখন সকুলে পড়ে । কি সুন্দর ধবধবে সাদা কাপড়ে বোনটা শুয়ে থাকতো । তপুর মা পাউডার মেখে দিত গায়ে । মাঝে মাঝে খিক খিক করে হেসে উঠতো মেয়েটা । হাসিব সাহেব অফিস থেকে ফিরে মেয়ে নিয়ে বসতো । তপু তখন ওদের চারিধারে ঘুর ঘুর করতো । হাসিব সাহেব কত কথা বলতেন মেয়ের সাথে । তপু ছোট বলে ওর কোলে দেয়া হতো না । হাসিব সাহেব কোলে নিলে তপু পাশ থেকে ধরতো । কি সুন্দর নরম নরম হাত এসে পড়তো তপুর গায়ে ।

কিছুদিন যেতেই মেয়েটার ঠান্ডা লাগলো । সেই থেকে নিউমনিয়া । হাসিব সাহেব মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন । অনেক চেষ্টা করলো ওরা কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না । সপ্তাহ খানেক পরে মেয়েটা মারা গেল ।

মাঝে মাঝে বোনটার কথা মনে পড়ে তপুর । পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ের ঢালে শুয়ে আছে মেয়েটা । হাসিব সাহেব গিয়ে ঝাড় দিয়ে আসে কবরের চারিপাশ । প্রতি বছর ওর মৃত্যু দিবস পালন করে ওরা । গরিব-মিছকিনদের খাওয়ায় আর দোয়া করে মেয়ের জন্য । তপুর বাবা-মা অঝোরে কাঁদতে থাকেন ঐ দিনটা এলে ।

তপুর মনে হলো, বোনটা আজ থাকলে ছবির সমান হতো । ছবির মতন হেঁটে বেড়াতো । মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি পড়ে রাজশাহী শহরে, হাজারো শব্দে আছড়ে পড়ে বৃষ্টির কণা । সেই শব্দের তালে তালে কে যেন ডেকে চলে, তপু ভাই, তপু ভাই, এদিকে আমি, আমাকে নিয়ে যাও । ঘুম ভেঙে যায় তপুর । ধড়ফড় করে উঠে বসে । তাকিয়ে দেখে সকালের আলো ফুটতে শুরু করেছে । শেষ রাত্তির আধার মিলিয়ে গেছে ।

।। ৩ ।।

অর্চনা

অফিসের কাজে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এসেছে তপু । সকাল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক একাউন্ট খুলে দিচ্ছে ওরা । তপুকে সাহায্য করছে তারেক সাহেব । । পেশায় তপুর চেয়ে দুই র‍্যাংক উপরে তারেক সাহেব । ছিম-ছাম হালকা পাতলা মানুষ । কথায় কথায় রেগে যান । ব্যাংকের সবাই চেষ্টা করে কিভাবে উনার রাগ আরো উস্কে দেয়া যায় । প্রতিদিনি এর একটা প্রোতিযোগিতা চলে ব্যাংক-অফিসারদের মধ্যে ।

দুপুর বারটার মধ্যে প্রায় বিশটা একাউন্ট খোলা হলো । ছাত্র-ছাত্রীরা লাইন ধরে একাউন্ট খুলছে । সবারি ভারী পোশাক । উত্তরের শিত সামলাতে অনেক বেগ পেতে হয় ওদের । ভারী কোট পড়েছে তপু । মোটা সুতীর সার্ট আর গলায় মাফলার । এই মাফলারটা বড় মামা এনেছিল ইন্ডিয়া থেকে । ধূসর রংয়ের উপর কালো সুতোর কাজ । হাতে নিলে গলিয়ে পড়ে ।

ইউনিভার্সিটি পড়ার সময় তপু ব্যাংক একাউন্ট খুলেছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখায় । অর্চনাকেও খুলে দিয়েছিলো এক্যাউন্ট । অর্চনা তখন থার্ড ইয়ারে, তপু মাষ্টার্সে । অর্চনার সাথে তপুর পরিচয় হয় ডিপার্টমেন্টের এক অনুষ্ঠানে । সিড়ি দিয়ে নামবার সময় অর্চনা পিছলে যায় । পাশ দিয়ে নামছিলো তপু । অর্চনাকে ধরে ফেললো ।

অর্চনা বললো, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, না হলে আজ ফ্র্যাকচার নিয়ে পড়ে থাকতে হতো ।

- নাও তো হতে পারতো, তপু হেসে বললো ।

- বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য ?

- আপনার কিছু করতে হবে না । বাসায় গিয়ে রেষ্ট নিন । কিছুটা হলেও তো ব্যথা পেয়েছেন ?

- একদম ব্যথা পাইনি । আমার নাম অর্চনা । থার্ড ইয়ারে পড়ি । আপনাকে ডিপার্টমেন্টে দেখেছি কিন্তু পরিচয় হয়নি ।

- আমি তপু । মাষ্টার্স করছি । এ বছরি বেরিয়ে যাবো ।

- তারপর কি করবেন ?

- ব্যাংকার হবার শখ । পড়া শেষ করে চাকরি খুঁজবো ।

- আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি? অর্চনা জানতে চাইলো ।

ওরা ঢুকলো করিম ভাইয়ের স্টলে । ডিপার্টমেন্টের সাথে ঝাপরা ফেলে করিম ভাইয়ের চা-বিস্কুটের স্টল । চার-পাঁচ জোড়া চেয়ার ফেলা আছে । ছেলে-মেয়েরা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গলা ভেজায় ।

- আপনার ফিউচার প্ল্যান কি ? তপু জানতে চাইলো ।

- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনে মাস্টার্স করবো । সম্ভবত বাইরে গিয়ে পড়ে আসব ।

- তারমানে চাকরিতে সহসাই ঢুকছেন না ?

- ঠিক তাই, অর্চনা বলে উঠলো । একবার চাকরিতে ঢুকলে পড়াশুনায় আর এগুনো যায় না । চাকরি তো পরেও করা যাবে কিন্তু পড়াশুনা পরে হচ্ছে না । আমাদের মেয়েদের অনেক কন্সট্রেইন্টস থাকে তাই তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করা চাই ।

তপু মাথা নেড়ে সায় দিল । কিছু বললো না ।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে গেল । তপুদের গল্প বন্ধ হলো যখন করিম ভাই দোকানের ঝাপ ফেলতে শুরু করেছে ।

তপু বললো, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দেই ।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে রোকেয়া হলের সামনে এলো । এর পেছনেই অর্চনা থাকে সামসুন্নাহার হলে ।

অর্চনা বললো, চলুন না রোকেয়া হলের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে, ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ডানে রেখে পেছন থেকে হলে ঢুকি ।

- ঠিক আছে চলুন ।

ওরা হাঁটা দিলো রোকেয়া হলের ফুটপথ দিয়ে । তপু দেখলো ফুটপাত ফুরে কিছুদূর পর পর বেরিয়ে আসছে বড় বড় পুরোনো গাছ । বসন্তকাল শুরু হয়েছে বাংলাদেশে তাই ঝরে যাওয়া পাতায় ছেয়ে আছে ফুটপাতটা । তারি মধ্যি দিয়ে পাতা মাড়িয়ে এগুচ্ছে ওরা ।

অর্চনা বললো, দেখেছেন কেমন নুতন পাতা গজিয়েছে গাছগুলোর মাথায় ?

তপু দেখলো, কচি কচি পাতায় ছেয়ে যাচ্ছে গাছগুলো । সেই গাছের ফাকে বিকেলের আলো এসে পড়েছে । সেই আলোর প্রক্ষেপণ গিয়ে পড়লো রোকেয়া হলের আষটে পড়া দেয়ালে ।

তপুর কাছে খুব আপরিচিত মনে হলো জায়গাটা । মনে হলো এখানে সে কখনো আসেনি অথচ দিনে কয়েকবার হাঁটা পড়ে এই রাস্তায় ।

অর্চনা বললো, আপনি জানেন আজ আমরা কতক্ষণ গল্প করেছি ?

- তিন-চার ঘন্টা হবে ।

অর্চনা বললো, প্রথম পরিচয়ে এত গল্প কখনো করিনি । কেনো এতো গল্প করলাম, সেইটে আবিস্কার করবার চেষ্টা করছি ।

- এই যে আপনাকে ফ্র্যাকচার থেকে বাঁচিয়েছি, তাই আমার প্রতি একটা উইকনেস গ্রো করেছে । সেখান থেকে ব্যাপারটা এসছে, এটা সাময়িক । বাসায় গেলে দেখবেন সব ভুলে গেছেন ।

অর্চনা চুপ হয়ে গেল । তারপর বললো,

- হয়তোবা কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি ।

- আপনার কি পূর্বের জন্মের কথা মনে পড়েছে ?

- পুনর্জন্ম বলতে কি কিছু আছে ? অর্চনা জানতে চাইলো ।

- পুনর্জন্ম তো অনেক ধর্মের মূল বিশ্বাসে আছে । পৃথীবিতে অনেক লোক পাবেন, যারা অবলীলায় পূর্বের জন্মের কথা বলে যাবে । এ নিয়ে অনেক গবেষণা চলে ।

- তাহলে আপনার সাথে আমার পুর্বের জন্মে দেখা হয়েছিলো ?

তপু হেসে বললো,

পুর্বের জন্মেই দেখা হোক আর এ জন্মেই হোক, আপনাকে ফ্র্যাকচার থেকে বাঁচিয়েছি, সেইটে আপনাকে দুর্বল করে ফেলেছে । আপনার প্রকাশ্যে মনে হচ্ছে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাজ করছে । আপনার এই ভাবনাটা আপনার অজান্তে হচ্ছে ।

অর্চনা হেসে বললো, আপনার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ ।

তপু বললো,

আমি দার্শনিক ব্যাখা দিচ্ছি না । এগুলো আমার মনে হয়েছে, তাই বললাম । আমার তথ্যটা ভুল হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে । বলতে পারেন মাসুদ রানার মতন ঢিল ছুড়েছি । আপনি কি জানেন, অনুমান সর্বস্ব ঢিল মাসুদ রানাকে কত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে ?

- এই মাসুদ রানা কৈ পেলেন ? অর্চনা জানতে চাইলো ।

- আমার বাবা খুব মাছুদ রানা পড়েন । সেখান থেকে পড়েছি ।

- আপনার বাবা মাছুদ রানা পড়েন ? এসব বইতো একটু অন্য ধাচের ।

তপু হেসে বললো,

পৃথীবিতে নানা বিচিত্র মানুষ ঘুরে বেড়ায় । আমার বাবা তারি একজন । বাবা অনেক পড়াশুনা করেন । বাবা তো ছেলেপুলেদের বইও পড়েন । যারা বই পড়তে পছন্দ করেন, তারা কোন বাছবিচার করে না । বই পেলেই পড়তে বসে যায় ।

অর্চনা বললো,

আপনি গুছিয়ে কথা বলতে পারেন । আপনার স্বপ্ন যে ভাল ব্যংকার হবার, সেটা পুরণ হবে ।

তপু কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ফুলার রোডে এসেছে । ডানদিকে ব্রিটিশ কাউন্সিল । তপু দেখলো ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাশ দিয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে । তার শেষ আলো পড়েছে অর্চনার নাকে-মুখে ।

তারপর তপু-অর্চনার সম্পর্ক অনেক দূর গড়ালো কিন্তু ওদের সম্পর্ক মেনে নেয়নি অর্চনার বাবা-মা । ওরা চায় ওদের মেয়ের বিয়ে হবে আর্কিটেক্টের সাথে । অর্চনার বাবা-মা দুজনই আর্কিটেক্ট । অনেকগুলো ফার্ম চালায় ওরা ।

একদিন অর্চনা এসে বলল, আমি আর পারছিনা বাবা-মার সাথে । বাবার হার্টের অসুখ । জোর করে কিছু করতে সাহস হয় না । কিছু হয়ে গেলে সারা জীবন আফসোস করবো ।

- তাহলে কি করতে চাচ্ছ ?

- বাইরে চলে যাবো । ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে এ্যাডমিশন পেয়েছি । আগামী শীতে সেশন ধরবো ।

একটু নীরব থেকে তপু বলল, ঠিক আছে । তুমি যা ভাল মনে করো ।

- প্লিস আমাকে ভুল বুঝো না । বাবা-মাকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবো না আমি ।
তপু এবারও কিছু বললো না । চুপ করে রইলো ।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন লান্চ আওয়ার পার হলো, তপুর খেয়াল নেই । তারেক সাহেব এসে বললেন, চলুন, লান্চ করে আসি । কি এতো ভাবছেন ?

তপু মাথা নেড়ে সায় দিলো তারপর ওরা হাঁটা দিলো । ব্যাংকের পাশেই ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়া । মাছ, মুরগি, শাকসবজি স্তরে স্তরে সাজানো আছে । ওরা খাবার তুলে নিল ।
তারেক সাহেব বললেন, অনেকগুলো একাউন্ট খোলা গেছে আজ, কি বলেন?
- হু । এক বেলাতে এতগুলো খোলা যাবে ভাবিনি ।
তারেক সাহেব বললেন,

কি ব্যাপার আপনি তো কিছুই নিচ্ছেন না । এটুকন ভাতে হবে ? মাছ মাংস কোথায় ?

- আরেকদিন খাব । আজ ফুলকফি আর লাউ দিয়ে খেয়ে যাই ।
তারেক সাহেব হেসে বললেন,

আপনি ব্যাচেলর মানুষ । বয়স আর কতই হবে ? এখনি তো খাবার সময় । আমাদের বারণ আছে, তাই খাই না ।
একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন,

বয়স কালে অনেক খেয়েছি মশাই । ভাজা পোড়া খেতে আমার ভাল লাগতো । আমার মা মুরগির মাংস ভেজে দিতেন আর ময়দার পড়াটা । চার পাঁচটা খেয়ে ফেলতাম এক সাথে । খুব খেয়েছি মশাই । এখন মনে পড়ে সে কথা ।
তপু কিছু বললো না । চুপ করে রইলো ।

।। ৪ ।।

নানার বাড়ী

বিকেল পাঁচটায় রিকশা নিলো তপু । অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চলেছে সে । এখান থেকে সাহেব বাজার বিশ মিনিটের পথ । বিকেল পড়তে শুরু করেছে তখন । শীতকাল বলে অল্পতেই আলো পড়ে আসে । রাস্তায় লোক কম বলে চারিদিকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা । সূর্য অনেকখানি হেলে পড়েছে আর তারি সোনালী আলো পড়েছে তপুর নাকে মুখে ।

অর্চনার কথা মনে হলো তপুর । অর্চনা বলেছিল, কদিন পরে তোমার কাছে চলে আসবো সারা জীবনের জন্য । কথা রাখতে পারেনি অর্চনা । বাবা-মার আপত্তির মুখে পিছু হটেছে সে । অবশেষে গেল ওয়াশিংটন । তাও তো অনেক বছর হয়ে এলো । অর্চনা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, তপু জানে না । এত দিনে নিশ্চয় বিয়ে শাদি করে ছেলে-পুলের মা হয়েছে, হয়তো একটু মোটাও হয়েছে, মনে হতেই তপুর হাসি পেল ।

একবার অর্চনারা দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো । টাংগাইল শহরে ওর নানার বাড়ি । ভদ্রলোক ডিসট্রিক্ট জাজ ছিলেন । অবসরের পর টাংগাইল শহরে থাকতে শুরু করেন । প্রথমে একটা কাঠের বাড়ি বানালেন তারপর মস্ত বড় পুকুর খুড়ে জলজ উদ্ভিদ লাগাতে লাগলেন ।

নানা এসে বললো, অর্চনা, এদিকে ।
অর্চনা দৌড়ে গেল নানার কাছে ।
- কেমন লাগছে লতা-পাতার গুচ্ছটা, পুকুরের ধারটা দেখিয়ে বললো । গত সপ্তাহে যশোর থেকে এনেছি ।

অর্চনা দেখলো, এক ঝাক লতা-পাতার গুচ্ছ আজস্র শাখা বিস্তৃত করে ভেসে আছে । পুকুরের মৃদু মন্দ ঢেউয়ে দুলছে সে । অর্চনার মনে হলো, আজ তপু থাকলে ওরও ভাল লাগতো । তপু এখন কি করছে বাসায় ? ঘড়িতে দেখল বেলা একটা । নিশ্চয় খেতে বসেছে ও ।

- কি, কেমন লাগলো, নানা জিঙেস করলেন ।

- দারুণ হয়েছে তোমার পুকুর সাজানো । বাগান সাজানো দেখেছি কিন্ত পুকুর সাজানো এই প্রথম দেখলাম ।

নানা হেসে বললেন,

আরো কত কিছু দেখবি জীবনে । কেবল তো জীবন শুরু হলো তবে পৃথীবির মতন এমন বহুমাত্রিক সৃষ্টি আর একটিও দেখবি না ।

- সেই বহুমাত্রিকের মধ্যে তুমি এক মাত্রিক ।

এ কথার উত্তর না দিয়ে নানা বললেন,

মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে । ভাবছি ওই ধার ঘেষে আরেকটা পুকুর খুড়বো । পুকুরটা সাজাবো লতা-পাতা দিয়ে তারপর তপুকে আসতে বলবো । দারুণ একটা ছেলে । কি বলিস ?

অর্চনা কথা বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

- কিরে চুপ হয়ে গেলি ?

- বাবা-মা তপুকে একদম পছন্দ করে না । ওকে নিয়ে টানা-হেচড়া নাইবা করলে ।

নানা হেসে বললেন, তুই একদম ভয় পাস নে । এ বিয়ে আমি দেবো । তোর বাবা-মা কে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার ।

অর্চনা কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

এর কিছুদিন পরে ভদ্রলোক মারা গেলেন ।

।। ৫ ।।

মায়ের চিঠি

বিকেল তিনটে বাজে । পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেলো । তপুর মা রাহেলা বেগমের চিঠি ।

তপু,

আমাদের দোয়া নাও । তোমাকে দেখি না অনেকদিন । কবে আসছো ঢাকায় ? তোমাকে নিয়ে দেশের বাড়ী যাবো । কত দিন দেশে যাই না ?। পারলে লম্বা ছুটি নিয়ে এসো ।

অর্চনার জন্য আর কত অপেক্ষা করবে ? দেখতে দেখতে সাতটা বছর কেটে গেলো । ও নিশ্চয় ছেলে-পুলে নিয়ে সংসার সাজিয়েছে এতদিনে । এবার ঢাকায় এলে তোমাকে বিয়ে দেবো । দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে । আমাদের বয়েস হয়েছে, তোমার বউকে সব বুঝিয়ে আমরা বিদায় নিব ।
ভাল থেকো । তোমার মা

রাহেলা বেগম

ব্যাগের খাঁজে চিঠিটা রেখে দিলো তপু । বাসায় গিয়ে আবারো পড়বে ।

।। ৬ ।।

সকালের বাজার

রাজশাহীতে আসবার সময় রান্নার ট্রেনিং নিয়েছে তপু । রাহেলা বেগম যত্ন করে শিখিয়েছে তপুকে । এখন আর রান্না করতে অসুবিধেয় পড়তে হয় না । আগের কাঁচা ভাবটা দূর হয়েছে । শাক-সবজি সুন্দর করে ধুয়ে রেধে ফেলে তপু । মাঝে মাঝে ফোড়ন দেয় যেন ঝাল-ঝাল ভাবটা জিয়িয়ে থাকে । ঝাল খেতে পছন্দ করে তপু ।

সকাল বেলায় তপু হাঁটা দেয় বাজারের দিকে । সাথে থাকে ছবি । ভোর থেকে ছবি বসে থাকে । যেদিন ব্যথা থাকে না, তপুর সাথে বাজারে যায় ও । সাহেব বাজার থেকে হাঁটা দেয় ওরা । তখনও শহর জেগে উঠেনি । দুই একটা রিকশা চলছে এদিক-ওদিক । সুর্যের আলো চাপ চাপ কুয়াশা ভেঙে ঢোকবার চেষ্টা করছে । আবছা আলো-আধারিতে সামনের জিনিষ ঠিক মতন দেখা যায় না । সেই আলো-আধারি মাড়িয়ে তপুরা এগুচ্ছে । শীতকাল বলে ভারী জামা চাপিয়েছে ওরা ।

ছবি বললো, আজ আমি বেছে দেবো । তুমি ঝুড়িতে তুলবে ।
ঠিক আছে, তপু মাথা নাড়ে ।

রাজশাহি শহরের চারিদিকে গ্রাম । গ্রামের লোকেরা শাক, সবজি আর ফল-মুল দিয়ে বাজার ভরে ফেলে । কি সুন্দর বড় বড় ফুলকপি, গাজর আর টমেটো নিয়ে বসেছে ওরা । রাস্তার পাশে বাজার বসেছে আজ । শাক-সবজি উঁচু হয়ে আছে দোকানে ।

ছবি হাত বাড়িয়ে ফুলকপি নিল । কি পরিস্কার ধবধবে সাদা ফুলকপি, কেবল ক্ষেত থেকে এসেছে । এখনো শিশির লেগে আছে গায়ে ।
- আর কি নেবো ?
- গাজর, টমেটো, আর শাক নাও ।
- ঠিক আছে, বলে ছবি এগিয়ে গেল ।

পাশের দোকান হরেক রকমের শাকে সাজানো । লাল-শাক নিলো ছবি । কেমন তরতরে তাজা । এক কেজি টমেটো নিলো, সেই সাথে কয়েকটা গাজর ।

তপুর ব্যাগটা আস্তে আস্তে ভরে উঠলো ।

- আর কিছু নেবো ?

- না আর লাগবে না, আবার তিন দিন পরে নেব । শাক-সবজি বেশি দিন রাখা যায় না ।

- আর কি কিনবে ?

- আর লাগবে না । তুমি কিছু নেবে ?

অনেকক্ষণ চিন্তা করে ছবি বললো, এখানে হুইসেল পাওয়া যায় ?

তপু হেসে বললো,

- এখানে পাবে না । শহরের দোকানে পাবে । কাল অফিস থেকে ফেরবার সময় নিয়ে আসবো । কি রংয়ের হুইসেল চাই তোমার ?

- হাওয়াই মিঠাই রংয়ের ।

- ঠিক আছে । কাল বিকেলে নিয়ে আসছি ।

ছবি খুশি হয়ে গেল তারপর বললো, হাসু-দাসুর জন্য চালের গুড়া নিতে হবে । ওদের খাবার শেষ ।

- ঠিক আছে চলো । সামনে পাওয়া যাবে । আমারও চাল ফুরিয়ে গেছে ।

তপু-ছবিরা পাশের দোকানে ঢুকলো । সকাল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, সকালের আলো এসে পড়ছে বাজারের গলিতে ।

।। ৭ ।।

বিকেলের পদ্মা

আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না । কেমন ছাড়া-ছাড়া লাগছে সকাল থেকে । হাতের কাজ তাড়াতাড়ি গুছিয়ে অফিস থেকে বেরুলো তপু । তখনো বিকেল গড়িয়ে যায়নি, সুর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে আছে চারিপাশে । অফিস থেকে বেরিয়ে বিপদে পরে গেলো তপু । কোথায় যাবে সে ? এই শহরের কাউকে চেনে না সে ।

ওদিকে দাঁড়িয়ে কোন আইসক্রিম খেলো তপু তারপর হাঁটা দিলো পদ্মার দিকে ।

এই শহরের লোকেরা সারাদিনের শেষে পদ্মার পাড়ে এসে দাঁড়ায় । সামনেই বয়ে চলেছে পদ্মা । পুরোটা শহর বাঁধ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে যেন বর্ষাকালে পানি ঢুকতে না পড়ে । সেই বাঁধের পরে পায়ে চলার পথ । সেপথ দিয়ে শহরের লোকেরা ঘুরে বেড়ায় । মাঝে মাঝে চা বিস্কুট খায় তারপর সন্ধ্যে নামলে ঘরে ফেরে ।

তপু যখন পদ্মার পাড়ে পৌছলো, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে । সূর্যের শেষ আলো পড়েছে বাঁধের গায়ে । ক্ষুধা লেগেছে তপুর । এক প্যাকেট বাদাম কিনলো তারপর হাঁটা দিলো বাঁধ বরাবার ।
কিছু দূর হাঁটতেই মেয়েলি কণ্ঠের ডাক শুনলো তপু ।
- তপু ভাই কখন এলেন ?
তাকিয়ে দেখল সীমা । হাওয়াই মিঠাই রঙের শাড়ি পড়েছে সে । হাতে কাল চুড়ি । তপুদের ব্যাংকে জয়েন করেছে বছর দুই হলো ।
তপু বললো, এই তো এলাম । আপনি ?
সীমা বললো,
অফিস থেকে ফেরবার পথে ভাবলাম পদ্মার পাড় ঘুরে যাই । আপনাকে পেয়ে ভাল হলো ।

শ্যামলা মেয়ে সীমা । সব সময় হেসে কথা বলে । অফিসের সবাই সীমাকে পছন্দ করে পরিচ্ছন্ন ব্যবহারের জন্য । সীমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা । ভাল রেজাল্ট নিয়ে পাশ করেছে সীমা । সাবজেক্ট ছিল একাউন্টিং । অংকে ভাল বলে একাউন্টিং বেছে নিয়েছিল ও ।

- বাদাম নিন, বাড়িয়ে দিলো তপু ।

- ধন্যবাদ, বলে সীমা বাদাম তুলে নিলো তারপর খেতে খেতে বললো, খুব ভাল হয়েছে বাদাম ভাজাটা । মধুর ক্যান্টিনের রহিম ভাই এভাবে বাদাম ভাজতেন ।

- আপনার ভাল লাগে বাদাম ?

সীমা হেসে বললো, ভালই তো, সময় কেটে যায় । তারপর ঈদের ছুটিতে কি করছেন ? ঢাকায় যাবেন না ?

- হু যাচ্ছি । আপনি ?

- ঢাকায় না গিয়ে উপায় কি বলুন । এখানে কোথায় ঈদ করবো ?

তপু বললো, এবার লম্বা ছুটি পড়েছে । অনেকে আগাম ছুটি নিয়েছে ।

- আমিও সেই দলে ।

- তাহলে তো বাসায় সবাই আপনার প্রতিক্ষায় ?

সীমা বলতে লাগলো,

মা শীতের পিঠা নিয়ে রেডি । ছোট বোনটা অনেকগুলো গান রিহার্সেল দিয়েছে । ঢাকায় গেলে শুনাবে । পাশাপাশি ওকে হারমোনিয়ামটা দেখিয়ে আসবো ।

- আপনি গান পারেন নাকি ?

- কিছু কিছু তবে গানের চেয়ে মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দিকে ঝোঁক বেশি ।

- কি কি ইন্সট্রুমেন্ট আপনার প্রিয় ?

সীমা বলতে লাগলো,

হারমোনিয়ামটা ভালো লাগে আর ভালো লাগে গিটারে গান তুলতে । একটা গান তুলতে সময় লাগে অনেক কিন্তু তোলবার পর খুব ভালো লাগে ।

- কোন ধরনের গান বেশি তুলেন ?

- এর কোন ঠিক নেই কারণ সব গান-ই আমার পছন্দ তাই গিটারে গান তুলতে বাছবিচার করি না । যখন যেটা ভালো লাগে, তুলে ফেলি ।

তপু বললো, কি কি ধরনের গান বেশি তুলেছেন ?

- জন ডেনভারের প্রায় সব গান তুলেছি । বিটলসের বেশ কিছু । রবীন্দ্রনাথের বর্ষা নিয়ে কোন গান বাদ যায়নি । পুরানো কালের কিছু গান তুলেছি । এবার বাচ্চাদের গান তুলবো । আপনি এসব কিছু বাজান না ?

- আমি ব্যাংকিং ছাড়া আর কিছু জানি না মিস সীমা । চেষ্টা করেছিলাম এসব বাজাতে । গিটারের স্কুলে বাবা ভর্তি করে দিয়েছিলেন কিন্তু শেষমেষ পারিনি । কোথায় যেন গিয়ে আর এগুতে পারি না ।

- আপনার না পাড়লেও চলবে । এত অল্প বয়সে কতগুলো প্রমোশন পেয়েছেন, তা একবার ভেবে দেখেছেন?

তপু লজ্জা পেয়ে গেলো । বললো,

জন ডেনভারের গান শুনেছিলাম । Sun shine on my shoulders makes me happy । সেই সাথে বিটলস এর Let it be ।

সীমা হেসে বললো,

ইংরেজি গান শুনতে শুরু করি Let it be দিয়ে । গানটা শোনবার পর থেকে ইংরেজী গানের দিকে ঝুঁকে পড়ি তারপর একে একে জন ডেনভার, আবা, কারপেন্টার শুনি । তবে এসব গান এখন পুরোনো হয়ে গেছে তারপরেও ভাল লাগে শুনতে ।

তপু বললো, সারাদিন অফিস করে কখন এসব করেন ?

- ব্যাংকিং হলো আমার পেশা আর গিটার হলো নেশা । এ দুটোই আমার পছন্দ তাই ব্যাংকিং সেবা দিতে অথবা গিটার বাজাতে কখনো পিছপা হই না । রাতে ডিনার সেরে কিছুটা সময় হলেও বসি গিটার নিয়ে । তখন যেটুকু পারি গান তুলবার চেষ্টা করি । রাতে গিটার না বাজিয়ে ঘুমোতে পারি না ।

- নিজ থেকে গান-বাজনা শুরু করেছেন না কেউ ধরিয়ে দিয়েছে ?

সীমা বললো, গিটারের বাতিকটা দাদাজির কাছ থেকে পেয়েছি । উনি ঘুমানোর আগে ইন্সট্রুমন্ট না বাজিয়ে শুতে পারতেন না ।

শহরের একপ্রান্তে বাড়ি নিয়েছে সীমা । তিন রুমের বাড়ি সামনে এক ফালি বসবার ঘর । তার সাথে লাগোয়া বারান্দা । সীমার বাড়িটা একেবার পদ্মার ধারে । ঘরে বসে পদ্মার হাকডাক কানে আসে সীমার । মুনা বুয়া আছে সীমার সাথে । ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে মুনা বুয়াকে । সীমার মা মুনা বুয়াকে দিয়ে দিয়েছে সীমার সাথে । যেদিন খুব গরম পড়ে, বারান্দায় পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ে সীমা । তখন একেবারে সামনে চলে আসে আকাশ । আকাশের নীলিমায় ছিটিয়ে আছে হাজারো নক্ষত্র । ঠিক কতগুলো নক্ষত্র আছে তার একটা হিসেব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সীমা ।

তপু বললো, জন ডেনভার সম্ভবত কিছুদিন আগে প্লেন চালাতে গিয়ে মারা গেছে?
সীমা বললো,

ঠিক তাই । Country Song এর অপুরণীয় ক্ষতি হলো অবশ্য আজকাল অনেকেই Country Song ভাল গায় কিন্তু জন ডেনভারের মতন আবেদন কেউ তৈরি করতে পারেনি ।

দেখতে দেখতে ওরা বাঁধের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে । এর পরে কাঁচা রাস্তা । কাঁচা রাস্তাটা বাঁধের ঢাল বেয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে ।
সীমা বললো, ঈদ কি ঢাকাতে করছেন না অন্য কোথাও ?
- ঢাকাতেই করবো । বাবা-মা আছেন । ওদের নিয়ে ঈদের দিনটা পার করবো । আপনি ?
সীমা বলতে লাগলো,

ঢাকাতে ঈদ করে দেশের বাড়ি যাবো । ওখানে দুদিন থাকবো তারপর বিকেলের ট্রেনে ফিরে আসবো । বাসার গাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু ইচ্ছে করেই নেব না । রাতের ট্রেন ধরবো । রাতের ট্রেনে ক্ষেত-খোলা মাড়িয়ে যাবার মজাই আলাদা ।
- তাহলে তো শীতের সকালের খেজুরের রস খাচ্ছেন এবার ?
- ঠিক ধরেছেন । কালু মিয়াকে বললে খেজুরের রস ঠিক ঠিক জোগার করে দেবে । আমার কিন্তু দারুণ লাগে । আপনি খেয়েছেন কখনো ?
তপু বললো,

বহুবার । তবে সবচেয়ে ভাল লাগে শীতের পীঠা । শীতকাল এলে আমার মা গুড়ের পিঠা বানাতে বসেন । তারপর আমরা ঘুম থেকে উঠলে আমদের পাতে বিছিয়ে দেন । কি সুন্দর ধান আর গুড় মাখানো পিঠা । গরম বলে বাবা একদম খেতে পারে না । মা হালকা করে ভেঙে দেয় যেন

ভেতরের বাষ্প বেরিয়ে যায় তারপর আমি আর বাবা অনেকগুলো খেয়ে ফেলি । আমার মা সবার অলক্ষে দেখেন মন ভরে ।

সীমা বললো, আপনার বুঝি আর কোন ভাই বোন নেই ?

- আমার এক বোন ছিল । জন্মের চার মাস পরে মারা যায় । আমরা তখন পার্বত্য চট্রগ্রামে । ওকে আমরা পাহাড়ি ঢালে কবর দিয়ে এসেছি । সেই থেকে প্রতি বছর ওর মৃত্যু দিবস পালন করি আমরা । অনেক ফকির মিসকিন খাওয়ানো হয় । বাবা-মা অঝোড়ে কাঁদতে থাকেন ঐ দিনটা এলে ।

সীমা চুপ হয়ে গেল । বললো, আমি জানতাম না । আমাকে ক্ষমা করবেন ।

তপু হেসে বললো,

ক্ষমা চাইবার কি আছে ? জন্ম-মৃত্যু না চাইলেও আসবে, এ ফেরাবার না তারপরেও চার মাসের এক শিশুর মৃত্যু না হলে এমন কি ক্ষতি হতো?

সীমা উত্তর দিলো না । অগের মতন চুপ হয়ে রইলো ।

দুজন চুপ হয়ে আছে । কেউ আর কথা বাড়াতে পারেনি । এদিকে সূর্য ডুবে গেছে নদীর ঘাটলায়, সবাই বাড়ি ফিরছে । তপুরাও হাঁটা দিল বাড়ির দিকে ।

।। ৮ ।।

সকালের মেলা

আজ ছুটি । ব্যাংকে যাবার কোন তাড়া নেই তাই ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হলো তপুর । ফযরের নামাজ কাজা হয়েছে দেখে আফসোস হলো । তাড়াতাড়ি নামাজ সেরে নাস্তা নিয়ে বসেছে ও । হঠাৎ ছবি এসে হাজির ।

ছবি বললো, বেগম বাজারে মেলা বসেছে । চলো যাই ।

- ঠিক আছে । বাবার কাছে পারমিশন নিয়ে আস ।

- পারমিশন নিয়ে এসেছি ।

সকাল দশটা বাজতে ওরা বেরুলো মেলা দেখতে । রিকশায় চেপে বসেছে ওরা । এখান থেকে বেগম বাজার পনেরো মিনিটের পথ । সারা আকাশে এক তিল মেঘ চোখে পড়লো না তপুর । ডাইনে তাকিয়ে দেখলো এক ঝাক রাজহাস পদ্মার দিকে উড়ে চলেছে । সারা বেলা পদ্মার পাড়ে দৌড়ঝাপ পাড়বে ওরা তারপর সন্ধ্যে হলে ঘরে ফিরবে ।

দেখতে দেখতে মেলা চলে এলো । কি সুন্দর হাওয়াই মিঠাই রংয়ের কাপড় দিয়ে প্যান্ডেল টানিয়েছে ওরা । প্যান্ডেলের নিচে হাজারো জিনিষ । ছুটির দিন বলে অনেকে এসেছে । বেছে বেছে কাঠের বাশি, প্লাষ্টিকের পাতিল আর লম্বা হুইসেল কিনলো ছবি । কি সুন্দর হাওয়াই রংয়ের উপর গাড় সবুজের কাজ । থেকে থেকে হুইসেল বাজাতে লাগলো ও । হাসু-দাসুর জন্য মাটির বাটি আর ছিকা কিনলো যেন আশে-পাশে ঝুলিয়ে দেয়া যায় । সেই বাটিতে বসে হাসু-দাসুরা পানি খাবে । রোদ-বৃষ্টি পড়ে হাসু দাসুদের ঘর ঝির ঝিরে হয়ে গেছে । যখন খুব বৃষ্টি নামে, চুক চুক করে পানি ঢোকে ঘরে । মজবুত গাড় পেইন্ট কিনলো ছবি । পেইন্ট দিয়ে ঘরটা রং করে দেবে যেন পানি না ঢুকতে পারে । একটা টর্চ কিনলো যেন রাতের বেলায় হাসু-দাসুদের উপর নজর রাখা যায় । পাড়ার বেজিগুলো খুব উৎপাত করে । সুযোগ পেলেই হাসু দাসুদের ছোবল দেয় । যখন হাসু দাসুরা বারান্দায় খেতে নামে, ছবি পাহাড়া

দেয় । কোন দিক থেকে বেজি নেমে আসবে তার ঠিক নেই । হাসু দাসুদের ঘরটা বাশের খুঁটির উপর করা যেন কেউ বেয়ে না উঠতে পারে । নিশ্চিন্তে হাসু দাসুরা ঘুমায় ঐ ঘরে ।
সকাল বেলায় হাসু দাসুদের ক্ষুদা পায়, তখন ছবিকে ডাকতে থাকে । চালের গুড়া বিছিয়ে দেয় ছবি । মাঝে মাঝে মার কথা মনে করবার চেষ্টা করে ছবি কিন্তু মনে আসে না । ছবির জন্মের দুই বছর পর মারা যায় ছবির মা । যখন খুব ব্যথা হয়, তখন মা কে দেখতে ইচ্ছে হয় ছবির । হাসু দাসুদের কোলে নিয়ে বলে, আমার মার কাছে উড়ে যা । বলবি আমার খুব অসুখ । তাড়াতাড়ি আসতে বলবি ।
হাসু দাসুরা মাথা নেড়ে সায় দেয় তারপর উড়ে যায় ছবির মার খোঁজে ।

কাপড়ের স্টলে ঢুকে ধুসর রংয়ের চাদর কিনলো তপু । কি সুন্দর মোলায়েম কাপড়ে বুনানো, চারিধারে হলুদ সুতোর কাজ, মাঝখানে গোলাপি ফুল । নূতন কাপড়ের গন্ধ নাকে এলো ওর । ছবির জন্য স্কুল ব্যাগ কিনলো । চার-পাঁচটা ঘর আছে ভেতরে । ব্যাগটা খুলতেই চামড়ার গন্ধ নাকে এলো ওর ।

দিনভর মেলা দেখে ফিরেছে তপুরা । ছবি তো খুব খুশি । ওর ব্যাগ ভরে আছে হুইসেল, কালার পেনসিল আর হারিপাতিল দিয়ে । বাসায় নেমে খেলতে বসে গেলো ছবি । তখন সন্ধ্যে নামছে সাহেব বাজারে ।

ঘর-দোর গুছিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লো তপু । তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে । কাল সকাল-সকাল অফিস । বিকেলে বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে শহরে । হালকা একটা কাথা নিয়ে পুবের জানালাটা খুলে শুয়ে পড়লো তপু । বাইরে তাকিয়ে দেখলো সারাটা আকাশ স্থির হয়ে আছে আর এই স্থিরতার মাঝে হাজারো নক্ষত্র টিপ টিপ করে জ্বেলে চলেছে ।

তপু দেখলো, শীতল হাওয়া জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকছে । সেই হাওয়ায় তার মশারিটা দুলছে থেকে থেকে । তপু ঘুমিয়ে গেলো । ঘুমের মধ্যে দেখলো সে আর অর্চনা হাঁটছে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রাস্তা দিয়ে । তখন মধ্য বেলা গড়িয়ে গেছে ।
অর্চনা বললো, আজ বিকেলে কি করছো ?
- ক্লাস আছে, রবিন স্যারের ক্লাস ।
- ক্লাস থাকলে তো করতেই হবে । তাহলে কখন যাচ্ছো মেলায় ?

- তুমি তৈরি থেক । ঠিক পাঁচটায় আমি আসবো হোস্টেলের গেটে ।

অর্চনা মাথা নাড়লো । বললো, কি কিনবে ?

- কিছু কিনবো না । শুধু দেখতে যাব এ বছর ওরা কেমন সাজিয়েছে । তুমি ?

- আমিও কিনবো না । ঘুরে ঘুরে দেখবো । আমাকে কিন্তু সাতটার আগে ফিরতে হবে কারণ হলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে ।

ঠিক আছে, বলে তপু মাথা নাড়লো ।

।। ৯ ।।

সীমা

সারা সপ্তাহের পর বুধবার এলো । আজ অফিস হয়ে দুদিন ছুটি । সবাই হোলিডে মুডে আছে । বিকেল পাঁচটায় তপু বেরুলো । বেগম বাজারে কিছু কেনাকাটা আছে । প্রতি বুধবার বিকেলে তপু কেনা কাটা করে । আসার সময় ছবিকে কথা দিয়েছে, ওর জন্য হুইসেল নিয়ে যাবে । ছবির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না কদিন হলো ।

যখন বেগম বাজার পৌছলো তপু তখন সূর্য হেলে পড়েছে । রিকশা থেকে নামতে দীর্ঘ ছায়া পড়লো রাস্তায় । দোকানে ঢুকে সাবান, রেজর আর টিসু কিনলো । পাশের দোকান থেকে ছবির জন্য কেক আর হুইসেল নিলো । ওদিকে থেকে এক সেট কাপ কিনলো । কি সুন্দর আলতো করে লতাপাতা ছড়িয়ে আছে কাপের গায়ে । ফিরবার সময় একজোড়া চপ্পল নিলো, ঘিয়া রঙের উপর ধুসর পাদানি । একেবারে নিরেট চামরা । চামড়ার গন্ধ নাকে এলো তপুর ।

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই শুরু হলো বৃষ্টি । শীতকাল এখনো শেষ হয়নি বাংলাদেশে তারপরেও আকাশ ভার হয়ে থাকে এই অবেলায় । সকাল-সন্ধ্যে বৃষ্টি ঝরছে । রাত হলে কোলা ব্যাঙ ডাকে শহরের ঝিলে । তপুর বাসার পাশেই ঝিল । প্রতি রাতে ব্যাঙ ডাকে সেই ঝিলে ।

তপুর আর বাসায় ফেরা হলো না । বৃষ্টির দাপটে সবাই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে । কি সুন্দর ধব ধবে সাদা বৃষ্টি । বৃষ্টির আবরণে রাস্তার গাড়িগুলো আবছা হয়ে এলো । রিকশায়ালারা টোপর পড়তে শুরু করেছে । গাড়িগুলো এগুচ্ছে ধীরে ধীরে ।

দোকানগুলোর পাশেই কাচে ঘেরা রেষ্টুরেন্ট । ঢুকে পড়লো তপু । ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে গেলো ওর ।

দশ-বার জোড়া বেতের চেয়ার সাজানো আছে পাশাপাশি । চেয়ারের উপর ছোট-ছোট কাপড়ের বালিশ, বালিশের ধার ঘেষে কালো সুতোর কাজ । একটা বড় ওয়াল পেইন্ট ঝুলে আছে দেয়ালে । সারি সারি তালগাছের নিচে ভেড়ার দল দাঁড়িয়ে আছে । কে আঁকলো এই স্কেচটা ?

রেষ্টুরেন্টের মাঝ বরাবর মস্ত বড় বাঁশ-বেতের টেবিল । টেবিলের পাড় ঘেষে ছোট ছোট টুল । বাচ্চাদের আলাদা করে বসার ব্যবস্থা করেছে ওরা । তপু দেখলো, কাঠ দিয়ে বানানো কয়েকটা ছবি ঝুলে আছে ডান দিকের দেয়ালে । বাঁ পাশে একটা ডিভান, সেই ডিভানে গিটার রাখা আছে । মাছের এ্যাকোরিয়াম চোখে পড়লো ঘরের প্রান্তে । ছবিকে একদিন নিয়ে আসবে তপু তারপর ওকে আইসক্রিম খেতে দেবে । ভ্যানিলা আইসক্রিম খেতে ছবির পছন্দ ।

এপাশের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো তপু তারপর সামনে তাকাতেই দেখলো সীমা বসে আছে ঘরের শেষ টেবিলে । ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ।
তপু এগিয়ে গিয়ে বললো, কখন এলেন ?
- এই তো কিছুক্ষণ । হঠাৎ করে বৃষ্টি নামতে ঢুকে পড়েছি । চা, কফি কিছু খাবেন ?
তপু মাথা নাড়লো ।
সীমা বললো, আজ আমি খাওয়াবো । সেদিন তো আপনি বাদাম খাওয়ালেন ।
তপু মাথা নেড়ে সায় দিলো ।

দেখতে দেখতে ম্যানগো জুস চলে এসেছে । পাকা আমের রস দিয়ে বানিয়েছে জুসটা । জুসের মাথায় লালটে ফেনা, থেকে থেকে ফুলে উঠছে । বরফের কুচি দেয়া আছে জুসের খাঁজে খাঁজে ।
- নিন, বলে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো তপুর দিকে ।
তপু বললো, দেশে কেমন কাটালেন ?
- ঈদ করলাম ঢাকায় পরদিন দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম । এক রাত থেকেছি । কাঁচা খাজুরের রস খেয়েছি ভোর রাতে ।
- আর কি কি করলেন ?

সীমা বললো,

ক্ষেতে গিয়েছিলাম সীম খেতে । কি সুন্দর আলতো করে সিম পড়ে আছে ক্ষেতে । তুলে তুলে আমি আর ছোট বোন অনেকগুলো খেলাম । ক্ষেত থেকে খেতে স্বাদি আলাদা । তারপর বেলা পড়ে এলে নৌকাতে চড়া । বাড়ির পেছনে খাল চলে গেছে, সেই খালে অনেকক্ষন ঘুরলাম । কি সুন্দর আঁকাবাঁকা হয়ে খালটা নদীতে পড়েছে ।

- খালটা কেমন ? অনেক চওড়া ?

- একদমি না । চিতল মাছের পেটের মতন । খুব বেশি হলে পাঁচটা নৌকা পাশাপাশি যেতে পারবে কিন্তু স্রোত আছে প্রচুর । এর সাথে যে নদীর যোগাযোগ আছে সেইটে বোঝা যায় ।

- আপনাদের ওদিকে কি বাতি গিয়েছে মিস সীমা?

- না । রাত বিরেতে হারিকেন জ্বালাতে হয় । সন্ধা নামতেই বাড়ির লোকেরা হারিকেন জ্বালিয়ে দিলো । সেই আলোতে আমার ছায়া গিয়ে পড়লো টিনের চালে । তখন যে কি মজা লাগছিলো ।

- তারপর কি হলো ? তপু অধীর আগ্রহে জানতে চাইলো ।

- দেশের বাড়ি বলে রাত আটটার মধ্যে ডিনারে ডাক পড়লো । আমরা দেরি না করে মাদুর পেতে বসে গেলাম । মাদুরের সামনে বড় বড় ইলিশের টুকরো, ভাত আর ডাল । কি বিশাল-বিশাল ভাতের এক-একটা দানা । ভাতের দানা যে এত বড় হয়, সেই প্রথম দেখলাম ।

তপু বললো, আমার বাবা যখন পার্বত্য-চট্রগ্রামে পোষ্টিং নিয়ে গেলেন, তখন ঐ সব দেখেছি । আর কি কি করলেন ?

সীমা বললো,

এবার দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে । এক ভদ্র-মহিলার সাথে কথা হলো । উনি খুব ভাল গিটার বাজান কিন্তু কখনো মিডিয়াতে আসেন না । উনি এমন এমন তথ্য দিলেন, যা শুনে আমি তো অবাক । রাজশাহী ফিরবার সময় সেসব আর্টিক্যাল নিয়ে এসেছি । এখন কাজ হলো সে সব পড়া । এখন মনে হচ্ছে কত কিছু অজানা ছিল গিটার নিয়ে অথচ এটাই আমি সারাদিন বাজাই । দাদাজিকে দেখতাম ইন্স্ট্রুমেন্ট বাজানোর পাশাপাশি অনেক পড়াশুনা করতেন । ইন্স্ট্রুমেন্টের উপর হেন বই নেই, যা দাদাজি পড়েননি ।

তপু মাথা নিচু করে বললো, জীবনের প্রথম গিটারটা কোথায় পেলেন ?

- প্রথম গিটারটা পাই দাদাজীর কাছ থেকে । হালকা ধরনের, ৫/৬ টা তার আছে । গিটারটা হাতে নিলেই কাঁচা বাশের গন্ধ নাকে আসে । অনেক পুরোনো হয়ে গেছে তবে যেখানেই যাই ও আমার সাথে সাথে থাকে ।

কাঁচাবাশের কথা শুনে তপুর মনে হলো পার্বত্য-চট্রগ্রামে অরণ্যের কথা । বাঙলোর জানালা দিয়ে প্রায়ই কাঁচা বাশের গন্ধ ভেসে আসতো । বৃষ্টির দিনগুলোতে সেই গন্ধ আরো প্রকট হতো ।

সীমা বললো, কিছুদিন পর অরেকটা গিটার কেনবার চেষ্টা করবো কিন্তু যেটা খুঁজছি সেটা পাচ্ছি না ।

- তাহলে কি করবেন ?

- ওরা বলেছে মাস খানেক পরে যেতে । এটা অনেক সফেসটিকেটেড । অল্প সময়ে অনেক গান তোলা যায় ।

- তাহলে তো জন ডেনভারে গান তুলতে কোন সমস্যাই হবে না । আগের চেয়ে আরো তাড়াতাড়ি তুলতে পারবেন ।

- ঠিক তাই । মজার ব্যাপার কি জানেন, এই রেষ্টুরেন্টে জন ডেনভারের অডিও আছে, শুনবেন?

তপু মাথে নেড়ে সায় দিল ।

সীমা গিয়ে ম্যানেজারকে বলে এলো । একটু পরেই শুরু হলো জন ডেনভারের গান । Sunshine on my shoulders makes me happy. তপুর মনে পড়লো পার্বত্য চট্রগ্রামে অরণ্যের কথা । বরাবরি খুব ভোরে উঠার অভ্যেস ছিলো তপুর । ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হলো সূর্যটা ঠিক কোথায় আছে, সেটা খুঁজে বের করা । বাঙলোর জানালা দিয়ে ঠিক ঠিক দেখা যেতো সূর্যটা । ঐ যে পাহাড়ের ফাঁক গলিয়ে উঠে আসছে সে । সূর্যের আভা এসে পড়তো তপুর নাকে-মুখে তারপর ছড়িয়ে পড়তো পাহাড়ী উপত্যকায় । তপু তাকিয়ে থাকতো যতক্ষণ না লাল আভাটা মিলিয়ে না যায় ।

ধীরে ধীরে গানটা শেষ হয়ে এলো ।

তপু বললো, গানটা শুনেছিলাম অনেক আগে । খুব ভাল লাগতো আমার ।

- এখন আর শোনেন না ?

- না ।

সীমা আর কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

কিছুক্ষণ পরে বললো,

আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি । আমি ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি পেয়েছি মাষ্টার্স করবার জন্য । আগামী শীতে ক্লাস শুরু । দু বছরের জন্য ছুটির দরখাস্ত করেছি ।

তপুর মনে পড়লো অর্চনার কথা । অর্চনাও তো পড়তে গিয়েছিলো ওয়াশিংটনে, তারপর আর যোগাযোগ নেই ।

তপু বললো, পড়াশুনা শেষ করে আবার ব্যাংকে আসছেন তো ?

- সে রকমি ইচ্ছে ।

- তাহলে তো ভাল, এই বলে তপু চুপ হয়ে গেল ।

এদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে । করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা রাস্তায় নামতে শুরু করেছে । বাতি জ্বলতে শুরু করেছে লাইট পোষ্টে ।

তপু বললো, চলুন, ফেরা যাক । সন্ধ্যে হয়ে এলো ।

চলুন, এই বলে ওরা উঠে পড়লো ।

।। ১০ ।।

মাটির প্যালেস

তপু লিখলো, গত রাতে ছবির ব্যথা হয়নি । এরকম রাত খুব কম গেছে । বিকেল বেলা ওকে নিয়ে পদ্মার পাড়ে যাব । এখান থেকে পদ্মা খুব কাছে, মিনিট বিশেকের পথ, রিকশায় যাতায়াত করা যায় ।

পদ্মার পাড় ঘেষে শহর রক্ষা বাঁধ আছে । বর্ষার মৌসুমে যখন পদ্মা দুরন্ত হয়ে উঠে, তখন বাঁধ শহরকে রক্ষা করে । কত বার যে বাঁধ ভাঙার উপক্রম হয়েছে, তার ইয়াত্তা নেই । প্রতি বিকেলে শহরের লোকেরা বাঁধে এসে দাঁড়ায় ।

পদ্মার পাড়ে পৌছতে পৌছতে বিকেল হয়ে গেলো ওদের । ছবির বাবা নিজাম সাহেব এসেছে ওদের সাথে । শীতকাল বলে পদ্মা শুকিয়ে গেছে । দুধারে জেগে উঠেছে সাদা বালুর চর । বিকেলের আলো পড়েছে চরে । থেকে থেকে চিক চিক করছে সেই আলো ।

ছবি বললো, তপু চাচা, একটা ঘর বানাবো বালু দিয়ে ।
ঠিক আছে বানাও, তপু বললো আস্তে করে ।
ছবি বসে গেল ঘর বানাতে ।
- কি বানাবো ? অনেক বড় প্যালেস না ছোট্ট ঘর ?
তপু বললো, প্যালেস বানাও ।
ছবি প্যালেস বানাতে শুরু করলো ।

অনেকখানি গর্ত করে বালুর ঢিপি তৈরি করলো ছবি তারপর সেই বালুর ঢিপি কেটে কেটে শুরু হলো প্যালেস বানানো । নিজাম সাহেব আর তপু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ।

ছবি বললো, তপু চাচা, প্যালেসে কটা গেট দেবো ?

- সামনে একটা বড় করে আর পিছনে ছোট্ট সাইজের ।

ছবি বললো, বাবা এবার তুমি বল, কটা গেট দেবো ?

নিজাম সাহেব হেসে বললেন, তপুর মতন করে দাও । সামনে মস্ত বড় একটা আর পেছনে ছোট সাইজের ।

ছবি কাজে মন দিলো ।

দেখতে দেখতে প্যালেস দাঁড়িয়ে গেলো । ছবির প্যালেসটা যে এতো সুন্দর হবে, ভাবতে পারেনি তপু । তপুর মনে হলো, এ্যানিমেশন আর গ্রাফিকস পড়লে ছবি অনেক ভাল করবে ।

কেমন হয়েছে ? ছবি জানতে চাইলো ।

ছবিকে কোলে নিয়ে তপু বললো, এত সুন্দর প্যালেস আমি কখনো দেখিনি । ছবি খুশি হয়ে গেল, জড়িয়ে ধরলো তপুর গলা । বললো, চাচা, তুমি খুব ভাল ।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে । সূর্যটা ডুবে গেছে পদ্মার ওপাড়ে । শীতটা আরো জেঁকে ধরলো ওদের । নদীর হাওয়ায় আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না । ছবির নাক-মুখ শক্ত করে জড়িয়ে দিলো নিজাম সাহেব ।

- চলো । এবার বাড়ি যাই, নিজাম সাহেব বলে উঠলেন ।

বাসায় পৌছতে পৌছতে মাগরিবের আজান দিলো । তপু অজু করে নামাজ পড়ে নিলো । আজ রাতে মিজান সাহেব খেতে বলেছে ।

ছবিদের বাড়িতে তপু যখন ঢুকলো, তখন রাত আটটা । গিয়ে দেখলো সব রান্না হয়ে আছে । সাদা ভাতের গন্ধ বারান্দায় এসে পড়ছে ।

ছবি বসলো তপুর পাশে । আজ সে ফুলকফি দিয়ে ভাত খাবে । ফুলকফি ভাজা ছবির খুব পছন্দ তাই কিছু দিন পর পর ফুলকফি রান্না হয় এ বাসায় । স্ত্রী মারা যাবার পর বুয়া রাখা হয়েছে । সেই তিনবেলা রাধে, মাঝে-সাঝে নিজাম সাহেব রেধে ফেলেন ।

এখন কেমন আছো ছবি ? তপু মাথা নুয়ে জানতে চাইলো ।

- এখন ভাল । আজ কিন্তু হাতির গল্পটা বলতে হবে ।

- ঠিক আছে, মাথা নেড়ে সায় দেয় তপু ।

- আজ কিন্তু গল্প না শেষ করে যেতে পারবে না । তুমি সব সময় অর্ধেক বলে চলে যাও ।

তপু হাসলো, কিছু বললো না ।

তারপর যেই হাতিটা আমার কাছে চলে এলো, আমি লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়লাম । হাতি তো আর গাছে উঠতে পারে না তাই নিচে দাঁড়িয়ে রইলো । এদিকে আমার ক্ষিদে পেয়েছে অথচ নামতে পারছি না কারণ হাতিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে । এখন কি করি ? গল্প বলতে বলতে তপু দেখলো ছবির মুখ শুকিয়ে আসছে । নীল রেখা পড়তে শুরু করেছে ছবির নাকে-মুখে ।

তপু বললো, এই ছবি, ব্যথা হচ্ছে?

- হ্যাঁ চাচা ।

মনে মনে খুদাকে ডাকতে লাগল তপু ।

- আমি কবে ভাল হবো, চাচা ?

- এই তো কটা দিন তারপর আর ব্যথা থাকবে না ।

ছবির মুখ আস্তে আস্তে নীল হয়ে এলো । মাঝে মাঝে খিচুনি দিচ্ছে ও । নিজাম সাহেব এসে দাঁড়ালেন । হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের পিঠে । অসহায়ের মতন তপু আর নিজাম সাহেব দাঁড়িয়ে রইলো ।

।। ১১ ।।

বিকেলের অফিস

বিকেল সারে পাঁচটা । তপু তার অফিসের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে । আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও বের হবে । ফোনটা বেজে উঠলো । রিসিভার তুলতেই বাকি সাহেবের গলা ।

- কেমন আছেন তপু সাহেব ?

- স্যার, আমি ভাল । আপনি ?

- আমিও ভাল । অফিস থেকে বেরুবার পথে একবার আমার রুমে আসতে পারবেন ?

- নিশ্চয়, পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি । ফোন রেখে দিলো তপু ।

বাকি সাহেব সদা হাস্যজ্জ্বল মানুষ । ব্যাংকের পিয়ন থেকে সবাই বাকি সাহেবকে পছন্দ করে । দুবছর হলো আছেন ম্যানেজার হিসেবে । যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হেড অফিসে তার ডাক পড়ে । বলা যায় উত্তরের ব্রান্চগুলো বাকি সাহেবের তদারকিতে চলে ।

বাকি সাহেবের রুমে ঢুকতেই তিনি অভ্যর্থনা করলেন ।

- তারপর কি খাবেন, চা না কফি ?

- না স্যার, লাগবে না । ধন্যবাদ ।

বাকি সাহেব হেসে বললেন, সু-খবর আছে, তাই মিষ্টি-কফির ব্যবস্থা করেছি ।

তপু হেসে দিলো । কিছু বললো না ।

দেখতে দেখতে সাদা রসগোল্লা এলো আর সেই সাথে কফি । কফি থেকে ধোয়া উড়ছে ।

- প্লিস নিন ।

তপু মিষ্টি তুলে নিলো ।

- তারপর কেমন চলছে আপনার কাজকর্ম ? শরীর-স্বাস্থ্য ভালো তো ?

তপু মাথা নেড়ে বললো, জি স্যার । আপনার ?

- আমাকে দেখে কি মনে হয় ?

তপু বললো, আপনার সাথে কোন অফিসারি হেঁটে পারবে না । আমিও কয়েকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি ।

- এর মূলে কি আছেন জানেন ?

- কি স্যার ?

- সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়া আর ভোর রাতে ছোলা খাওয়া । প্রতিদিন আপনার ভাবি এক গ্লাস দুধ দেয় । ওতে অনেক বল পাই । কখনো ভিজিয়ে রাখা ছোলা খেয়েছেন ?

- না স্যার, খাওয়া হয়নি ।

- তাহলে শুরু করে দিন । দেখবেন কেমন ফল পাচ্ছেন । সেরা ব্যাংকার হতে বেশিদিন লাগবে না । আগে তো শরীর ঠিক রাখা ।

তপু মাথা নেড়ে সায় দিল ।

বাকি সাহেব বললো,

সে যাই হোক, অনেক বড় করে না বলে বলি আপনাকে যে জন্য ডেকেছি । কি বলেন ?

- বলতে পারেন স্যার । কোন অসুবিধে দেখছি না ।

- আপনাকে একটা বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি । আমার ছেলেবেলার বন্ধুর মেয়ে । আমার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয় । রুপে-গুণে কোন ঘাটতি নেই । আপনার মতনি একজন ভাল ব্যাংকার ।

তপু চুপ হয়ে গেলো । সে ভাবেনি বাকি সাহেব তাকে ডেকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে ।

বাকি সাহেব বলতে লাগলেন,

এই তো গতকালও কথা হলো আমার বন্ধুর সাথে । ওর মেয়েটা চলে যাচ্ছে বাইরে । তার আগে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে । আমি তো আপনাকে চিনি । তাই ভাবছি অমন ভালো ছেলে-মেয়েদের জুটি বেধে দিলে নাকি বেহেস্তে এমনি এমনি সিট পাওয়া যাবে, এই বলে বাকি সাহেব হাসতে লাগলেন । তারপর বললেন, আমি আপনার কথা বললে ওরা ফেলবে না । আপনি তো আমাদের সেরা ব্যাংকার ।

তপু কি বলবে ভেবে পেল না । আগের মতন চুপ করে বসে রইলো ।

বাকি সাহেব বললো, নিন, কফি নিন ।

তপু কফি তুলে নিল ।

বাকি সাহেব বলতে লাগলেন,

আপনি নিশ্চয় মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চাইছেন ? আমি যে মেয়ের কথা বলবো তাকে অপছন্দ হবে না । আফসানা হক সীমা । আমাদের সীমা । ব্যাংকের একাউন্ট সেকশন দেখেন ।

সীমার কথা শুনে তপু মুখ তুলে চাইলো ।

বাকি সাহেব বললেন,

কি চমকে গেলেন তো ? ওরা দুই বোন । মা আছেন, হাউস ওয়াইফ । বাবা সরকারি কর্মকর্তা । কোন ঝুট ঝামেলা নেই সংসারে । ঢাকার মালিবাগে ওদের বাসা ।

কফিতে চুমুক দিয়ে বাকি সাহেব বলতে লাগলেন,

তপু সাহেব, আপনি বাসায় গিয়ে ভাবুন । আপনার বাবা-মার সাথে কথা বলুন । আমাকে সাত দিন পরে জানালে চলবে । আপনি সুখী হবেন ।

বাকি সাহেবের অফিস থেকে বেরিয়ে তপু রিকশা নিলো সোজা সাহেব বাজার । রাস্তার এধারে বিস্তীর্ণ খোলামাঠ, অন্যপাশে মানুষের থাকবার ঘর-বাড়ি, এরি মধ্যে দিয়ে রাস্তা । একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মেঘ কেটে যায়নি । দক্ষিণ আকাশে সাত রংগা রঙধনু উঠেছে । কি কি রঙ আছে, সেইটে দেখতো লাগলো তপু ।

একবার অর্চনা বলেছিল, বলতে পরবে রঙধনুতে কটা রং আছে ?

তপু বললো, সাতটা ?

-না । এর চেয়ে অনেক বেশি ।

- সেটা কি রকম ?

আর্চনা হেসে বললো, রঙধনুর চারিপাশ ঘিরে আরো অনেক আভা পড়ে, সেটা কখনো খেয়াল করে দেখেছো?

তপু কিছু বলেনি । চুপ হয়েছিল ।

।। ১২ ।।

গিড়িগুহা

পাহাড়ী নদীতে তপু সাম্পান বেয়ে চলেছে । পাশেই বসে আছে ছবি । দেখতে দেখতে ওরা গিড়ি গুহার ভেতরে ঢুকলো । এই গিড়ি গুহার কাছে তপু দীক্ষা নেয় । আবারো তপু শিখতে শুরু করেছে গিড়ি গুহার কাছে । এভাবে কিছুক্ষণ কাটলো তারপর হঠাৎ দমকা এক বাতাস এসে ছবিকে পানিতে ফেলে দিলো । ছবি ডুবতে শুরু করেছে । তপু আর দেরি করলো না । ঝাপিয়ে পড়লো পানিতে । তন্ন তন্ন করে খুঁজলো চারিপাশ । কোথাও ছবি নেই, ও তলিয়ে গেছে ।

বাইরের দরজায় অনবরত কড়া পড়ছে । ধরফরিয়ে উঠে বসলো তপু । সিকো ঘড়িটা রাত দুটো বাজতে চলেছে ।

- কে এলো এতো রাতে ?

দরজা খুলতেই নিজাম সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো,

- তপু সাহেব, ছবি যেন কেমন করছে ?

- সে কি ? চলুন ।

ছবি ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে । অল্প অল্প হাত নাড়ছে ।

তপু বললো, চলুন হাসপাতালে নিয়ে যাই ।

সাহেব বাজার থেকে হাসপাতাল পনের মিনিটের পথ ।

ডাক্তার বললো, ছবির নাড়ীর ঘা ফেটে ব্লিডিং শুরু হয়েছে । এখনি অপারেশন করতে হবে ।

ছবিকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হলো । টানা তিন ঘন্টা চললো অপারেশন । রাত তিনটেয় শুরু হলো অপারেশন, সেইটে চললো ভোর রাত পর্যন্ত । ঠিক ভোর ছটায় ডাক্তার বেরিয়ে এলো অপারেশন থিয়েটার থেকে ।

I am sorry মিজান সাহেব । ছবিকে বাঁচানো গেলো না । কোন ভাবেই রক্ত পড়া বন্ধ করা গেল না । আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি । আপনারা বডি নিয়ে যেতে পারেন । May Allah help you to bear the loss.

নিজাম সাহেব এসে দাঁড়ালেন । তপুকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলো । খবর পেয়ে সাহেব বাজারের করিম সাহেব এসেছে । তপু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ।

ডেড বডি নিয়ে আসা হলো । নীরব নিথর শুয়ে আছে ছবি । মাথাটা একদিকে কাত করা । ব্যথায় ব্যথায় কুকড়ে গেছে মুখটা । তপু দেখলো, ছবির ডান পাশে পড়ে আছে হাওয়াই মিঠাই রংয়ের হুইসেলটা । এতো ব্যথার মধ্যেও হুইসেলটা আনতে ভুলেনি ছবি ।

© Megh Chapeeye Brishti, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

।। ১৩ ।।

ঢাকাতে বদলি

এলো পাথারি বৃষ্টি ঝরছে ভোর রাত থেকে । পুরোটা শহর বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ছেয়ে আছে । মেইন রোড থেকে শুরু করে ঘরের বারান্দা, বাড়ির আঙ্গিনা, ব্যালকোনির চৌকোনা কোথাও বাদ পড়েনি । টানা সাতদিন বৃষ্টির পর ঢাকা শহরের তাপমাত্রা নেমে এলো । রাতে এখন কাথা চাপিয়ে শুতে হয় ।

দুবছর হলো তপু ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছে । এরি মাঝে প্রমোশন হয়েছে, এখন ব্যাংকের অনেক দায়িত্ব । অনেকদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় তপুর । বাসায় ফিরে নামাজ সেরে চারটি খেয়ে শুয়ে পড়ে । মাঝে মাঝে হাসিব সাহেব এসে বসে বিছানার ধার ঘেষে । শুরু হয় ওদের গল্প ।

একদিন হাসিব সাহেব বললেন, তোদের ব্যাংকে পার্ট টাইম লোকের দরকার পড়ে না ?

- হ্যাঁ পড়ে । আমরা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য । কেনো বাবা ?

- না বলছিলাম, আমি তো ঘরে বসে থাকি । না হয় আমি মাঝে-সাঝে গিয়ে কাজ করে এলাম ।

- কোথায় তুমি ঘরে বসে আছ ? দিনের বেলায় লাইব্রেরী দেখাশুনা করো । সন্ধ্যে নামলে স্কুল নিয়ে বস ।

হাসিব সাহেব হেসে বললেন,

লাইব্রেরি দেখতে আর কতক্ষণি লাগে ? ঘন্টা খানেক দেখলেই হয় তারপর সারাদিন বসে থাকি । সকুল তো বসে সেই রাতে । সারা দিন বসে থাকতে ভাল লাগে না ।

তপু হেসে বললো,

তারপরেও তোমাকে নেয়া যাচ্ছে না । আমাদের বয়সের লিমিট আছে । পার্ট টাইমারদের বয়স চল্লিশের নিচে হতে হবে । তুমি তো কখনো ঘরে বসে নেই বাবা । নিজের ছেলের টাকা কখনো ছুঁয়ে দেখনি । তোমার মতন এমন আত্মনির্ভর মানুষ কটা আছে ?

হাসিব সাহেব খুশি হয়ে গেলেন । বললেন,

নে ঘুমা । রাত অনেক হলো । কাল তো আবার ভোর হলে দৌড় দিবি । কখন যেন তোর অফিসটা ?

মাঝে মাঝে ছবিকে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় তপুর । ছবি বলে, আজ কি পদ্মার পাড়ে যাবে ?
তপু মাথা নেড়ে সায় দেয় ।
ছবি বলে,

এবার বড় করে ঘর বানাবো যেন আমি, তুমি আর বাবা থাকতে পারি । মস্ত বড় গেট দেবো ঘরের সামনে, বড় বড় জানালা ঝুলিয়ে দেব, তারপর মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকবো আমরা । কি বলো ?
তপু বলে, ঠিক আছে, এই বলে ছবির হাত ধরতে যায় । মিলিয়ে যায় ছবি । শত খুঁজেও আর পায় না ।

যেদিন রাতে খুব বৃষ্টি নামে, ছবির কথা মনে পড়ে তপুর । হয়তবা ছবি এই কাদার মধ্যে আলু থালু হয়ে কোথাও শুয়ে আছে । তখন আর ভাল লাগে না তপুর । ছবির মৃত্যুর পর ছবির বাবা নিজাম সাহেব চাকরিটা ছেড়ে দিলেন । হঠাৎ একদিন রেজিগনেশন লেটার নিয়ে হাজির । অফিস রুমটা খালি করে এলেন । এর কিছুদিন পর বাড়িটাও বিক্রি করে দিলেন । পাশের লোকেরাই কিনলো । এখন আর বাড়িটা নেই, ভেঙে ফেলা হয়েছে । মস্ত বড় গর্ত হয়েছে বাড়ির আঙিনায় । পাঁচ-তলা দালান উঠবে, নূতন মালিকের ছেলেপুলেরা থাকবে ।

হাসু-দাসুদের শেষ পর্যন্ত একটা গতি হয়েছে । ছবির খালা হাসু-দাসুকে নিয়ে গেছে । হাসু-দাসুরা এখন ছবির খালার সাথে থাকে । হাসু-দাসুর জন্য মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতো ছবি, সেটা ছবির খালার হাতে তুলে দিলো নিজাম সাহেব । এ টাকা হাসু-দাসুদের ।

বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিজাম সাহেব কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারে না । অনেকে বলে ভারতে চলে গেছেন, কলিকাতার পাশেই বাড়ি নিয়েছে । কেউ কেউ আবার নিজাম সাহেবকে বার আউলিয়ার মাজারে দেখেছে । সদরঘাটে একবার দেখা গিয়েছিলো, বরিশাল যাবার লন্চে বসেছে নিজাম সাহেব । এখন আর প্যান্ট সার্ট পড়েন না । লুনগি-সার্ট পড়ে ঘুরে বেড়ান । বির বির করে যেন কি বলেন । কেউ কথা বলতে এলে সরে যান ।

বিলেতে পড়তে গেছে সীমা । যাবার আগে ঢাকার এক ছেলের সাথে বিয়ে হয় । ছেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মার্কেটিং পড়ায় । সীমার চেয়ে বছর খানেক বড় হবে । তপু গিয়ে বিয়ে খেয়ে এসেছে । বিয়ের পিড়িতে সীমাকে আরো পবিত্র লাগছিলো । তপুর মনে হলো, অর্চনার কথা । অর্চনাও হয়তো এভাবে বিয়ের পীড়িতে বসেছে । কার সাথে বিয়ে হলো ওর ?

বাকি সাহেব আফসোস করে বললো, আপনি ভাল ব্যাংকার কিন্তু কখনই ভাল সিলেক্টর নন । এমন মেয়েকে কেউ হাতছাড়া করে ?
- ক্ষমা করবেন স্যার । আপনার অনুরোধটা রাখিনি ।
বাকি সাহেব হেসে বললেন, আপনার বিয়েটা আমি দেবো । দেখি আরেকটা মেয়ে পাওয়া যায় কিনা ।
তপু কিছু বলে না । চুপ করে বসে থাকে ।

বিয়ের জন্য তপুর বাবা-মা চাপাচাপি করে, কিছু বলে না তপু । উনারা এগুতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন ।

আমের মৌসুম এসেছে বাংলাদেশে । হরেক রকমের আমে ছেয়ে গেছে ঢাকা শহর । অফিস থেকে ফেরবার পথে আম নিয়ে আসে তপু । হাসিব সাহেব আম পছন্দ করেন । দুজনে বসে আম খায় ।

মাঝে মাঝে কালবৈশাখির উত্তাল হাওয়া বয়ে যায় তপুদের বাড়ির উপর দিয়ে । অনেকক্ষণ দাপাদাপির পর শান্ত হয়ে আসে সব কিছু তারপর শুরু হয়ে বৃষ্টি । জানালার কার্ণিসটা চাপিয়ে শুয়ে পড়ে তপু । মাথার কাছে সব সময় চাদর দেয়া থাকে । সেটা জড়িয়ে নেয় সারা শরীরে । মনে এসে ভর করে গিড়ি গুহার কথা । গিড়ি গুহার কাছে যা যা শিখেছিলো সেগুলো মনে মনে আওড়ায় । ফিরে পায় হারানো শক্তি । আবারও যাবে তপু গিড়ি গুহার কাছে । যা যা শেখা হয়নি আজও, শিখে আসবে সে সব । এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় বৃষ্টি থেমে আসে । ঘুমিয়ে পড়ে তপু ।

Please comment abut this book at: sayed.hossain@yahoo.com
Visit my personal website: www.sayedhossain.com
August 7, 2009.